June, 2020

ART & REVIEW

An Analytical Research & Development Repository

Volume II

বাংলার পুরাতত্ত্ব গবেষণাকেন্দ্র
কলকাতা পশ্চিমবঙ্গ ভারত

ART & REVIEW

A Collection of Peer Reviewed Research Articles

Collection of Research Articles presented at One Day National level seminar organised by Banglar Puratattva Gabeshana Kendra, Kolkata

Vol - II, June 2020

ISBN : 978-81-939021-9-6

© Banglar Puratattva Gabeshana Kendra, Kolkata

প্রথম প্রকাশ

কলকাতা, ২রা অক্টোবর, ২০২০ (১৫ই আশ্বিন, ১৪২৭)

প্রকাশক

বাংলার পুরাতত্ত্ব প্রকাশনা

১১৭, খান মহম্মদ রোড, দক্ষিণ বেহালা, কলকাতা - ৭০০০৬১

যোগাযোগ : ৯৮০৪৮৫৩৩৪৫

বর্ণসংস্থাপন

পানীন্দ্র সাধুখাঁ

মো : ৭৯৮০১৫৫৭৫০ / ৯৪৩৩৬০৭০১৩

মুদ্রণ

নিতাই সরদার

পূর্বপাড়া, বনগ্রাম, উত্তর ২৪ পরগণা

মূল্য

৩০০/-টাকা মাত্র

- মণিপুরের লোক নৃত্য লাইহারাওবা
  — রিঙ্কি মাহাতো 136

- The Conception and Misconception of Jihad :
  Its Global Interpretation and Justification
  — Koushik Chakraborty, Srimoyee Chakraborty 140

- Analytical Tecnique of the Sena Period Sculptures
  — Arindam Mandal 144

- The Site of Contestation
  — Simool Sen 149

- গার্হস্থ্য নির্দেশিকা ও নারীশিক্ষা : ঔপনিবেশিক পর্ব
  — কাবেরী ইন্দ্র 154

- বাংলা মঞ্চনাটকে লোক-সংস্কৃতি ভাবনার সম্পৃক্ততা : সংক্ষিপ্ত রূপরেখা
  — মৌ চক্রবর্তী 158

- ভারতীয় সমাজে নারীর স্থান
  — ড. সুরঞ্জন সরকার 162

- The Tradition of Terracotta Making Around Pandu Rajar Dhibi
  in Lower Ajay Valley : A Preliminary Ethno Archaeological
  Observation
  — Utpal Biswas, Dr. Jagamohan Jhankar 166

- মুর্শিদাবাদ জেলায় বিজ্ঞান আন্দোলনের প্রেক্ষাপটের ইতিহাস
  — শুভেন্দু বিশ্বাস 173

- The Rohingya Diaspora — their early history and
  the present day crisis
  — Anindita Basu Biswas 179

- নারী মননে বিদ্যাসাগর
  — সালাউদ্দিন আনসারী 184

- প্রাক-আধুনিক কলিকাতায় ইউরোপীয় সামাজিক ও
  সাংস্কৃতিক জীবন (১৬৯০-১৭৫৬খ্রিঃ)
  — অরুণিতা চন্দ্র 188

- 'পূর্ণ থেকে শূন্য" - উদ্বাস্তু নারী জীবনের অস্তিত্বের লড়াই
  — সুস্মিতা কর 194

মুর্শিদাবাদ জেলায় বিজ্ঞান আন্দোলনের প্রেক্ষাপটের ইতিহাস

শুভেন্দু বিশ্বাস*

বিজ্ঞানের কাজ শুধুমাত্র নতুন নতুন আবিষ্কার ও প্রযুক্তির উন্নতি ঘটিয়ে সভ্যতাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া নয়। এর একটা সামাজিক দায়িত্বও আছে। বিজ্ঞানের এই সামাজিক দায়িত্বের মধ্যে পড়ে সমাজ বসবাসকারী মানুষের মধ্যে যুক্তিবাদের আলো ছড়িয়ে দেওয়া, অন্ধভাবে কোন কিছুকে গ্রহণ না করে সত্যের কষ্টিপাথরে যাচাইয়ের মাধ্যমে নিজের জ্ঞানের পরিধিকে আরও বাড়িয়ে তোলা। ঔপনিবেশিক সময়ে ভারতে দু'ধরনের বিজ্ঞানের বিকাশ ঘটে।[১] এক, কলোনিয়াল সায়েন্স বা ঔপনিবেশিক বিজ্ঞান। এই বিজ্ঞান ব্রিটিশদের পৃষ্ঠপোষকতায় বিকশিত হয় এবং ব্যবহার করা হয় ব্রিটিশদের সাম্রাজ্যিক স্বার্থকে সুরক্ষিত করতে। আর দ্বিতীয়ত হল ন্যাশনাল সায়েন্স বা জাতীয় বিজ্ঞান। এই জাতীয় বিজ্ঞানচর্চার পৃষ্ঠপোষকতা করেন মহেন্দ্রলাল সরকার, জগদীশচন্দ্র বসু, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, সত্যেন্দ্রনাথ বসু প্রমুখ বিজ্ঞানী। মূলত এঁদের উদ্যোগেই শুরু হয় মাতৃভাষা বাংলায় বিজ্ঞানচর্চার কাজ। বিভিন্ন গ্রন্থ ও প্রবন্ধের মাধ্যমে বিজ্ঞানকে সহজ, সরল ভাবে প্রকাশ করা হতে থাকে। বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণ, বিজ্ঞানমনস্কতার বিকাশ ঘটানো এবং বিজ্ঞানকে সর্বসাধারণের জন্য ব্যবহারের উদ্দেশ্যে সূচনা ঘটে বিজ্ঞান আন্দোলনের। বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় করার প্রয়াস ঔপনিবেশিক সময় থেকে লক্ষ্য করা গেলেও, এর পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটে ১৯৭০র দশকে। এই সময় পশ্চিমবঙ্গে বিজ্ঞান আন্দোলনের যে ঢেউ ওঠে তা, মুর্শিদাবাদে পৌঁছাতে বিন্দুমাত্র বিলম্ব ঘটেনি। যার ফলে মুর্শিদাবাদ জেলায় বিজ্ঞান আন্দোলনের সূচনা হয়। প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে বিজ্ঞানের সংগঠন। প্রকাশিত হয় বিজ্ঞানের পত্রপত্রিকা। বিপুল কর্মযজ্ঞের মাধ্যমে জনগণকে বিজ্ঞানমনস্ক করে তুলতে এই জেলায় একের পর এক বিজ্ঞান সংগঠন গড়ে উঠতে থাকে। কিন্তু একটা প্রশ্ন উঠে আসা স্বাভাবিক যে, ১৯৭০এর দশকে মুর্শিদাবাদ জেলায় বিজ্ঞান আন্দোলনের সূচনা কেন ঘটলো ? কোন পারিপার্শিক অবস্থার মধ্যে দিয়ে জেলায় বিজ্ঞান আন্দোলনের প্রেক্ষাপট তৈরি হয়েছিল ? আলোচ্য গবেষণা নিবন্ধে মুর্শিদাবাদ জেলায় বিজ্ঞান আন্দোলনের প্রেক্ষাপট গড়ে ওঠার ইতিহাস তুলে ধরার প্রচেষ্টা করা হয়েছে।

একদা সুবা বাংলার রাজধানী হিসেবে মুর্শিদাবাদের খ্যাতি ছিল সর্ববিদিত। সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে মুর্শিদাবাদ জেলার অগ্রগামিতা লক্ষ্য করা গেলেও, বিজ্ঞানমনস্ক সমাজ গড়ে তুলতে এই জেলার ভূমিকা কিঞ্চিৎ ধীর গতিতে প্রবাহিত হচ্ছিল। এর একটা কারণ ছিল শিক্ষার দিক থেকে অনগ্রসরতা। শিক্ষার মাধ্যমেই মানুষের চিন্তা ভাবনার বিকাশ সম্ভব। জেলার অতীত ইতিহাসের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে বোঝা যাবে যে, প্রাথমিকভাবে খ্রিস্টান মিশনারিদের উদ্যোগেই জেলার শিক্ষা প্রসারিত হয়েছিল। মুর্শিদাবাদ জেলায় খ্রিস্টান মিশনারিদের উদ্যোগে বেশ কিছু বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তাঁরাই প্রথম এই জেলাতে ইংরেজি শিক্ষা চালু করেন।[২] তবে বিজ্ঞান শিক্ষা ছিল কয়েক যোজন দূরে। ইউরোপীয় মিশনারিদের পাশাপাশি ভারতীয়দের উদ্যোগও ছিল উল্লেখ্য। এক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন কাশিমবাজারের রাজপরিবার। উনিশ শতকের প্রথম দিকে বাংলাতে নবজাগরণের ফলে শিক্ষিত মানুষদের মধ্যে যে উদারমনা, কু-সংস্কারমুক্ত ও যুক্তিবাদী চিন্তা-ভাবনা জাগ্রত হয়েছিল তা কাশিমবাজারের রাজা কৃষ্ণনাথ রায়কে প্রভাবিত করেছিল। তিনি বিশ্বাস করতেন, একমাত্র আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষা তথা বিজ্ঞান শিক্ষাই মানুষকে যুক্তিবাদী করে তুলবে এবং উন্নত সমাজ গড়ে উঠবে। সেই উদ্দেশ্যকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার জন্য বানজেটিয়াতে একটি আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তুলতে উদ্যোগী হন, যেখানে পড়ানো হবে পাশ্চাত্যের জ্ঞান-বিজ্ঞান।[৩] সেই মতো তাঁর সমস্ত সম্পত্তি মুর্শিদাবাদ জেলাতে একটি বিশ্ববিদ্যালয় নির্মাণে ব্যয় করার জন্য উইলও করে যান। কিন্তু তিনি আত্মহত্যা করায় তা সম্ভবপর হয়নি। মহারাজা কৃষ্ণনাথের এই স্বপ্নকে পরিপূর্ণ করার জন্য, মহারাণী স্বর্ণময়ীর প্রচেষ্টায় ১৯৫৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় 'বহরমপুর কলেজ'।[৪] সেই সময়কার অনেক শুভানুধ্যায়ী ব্যক্তি কলেজ গড়ে তুলতে মুক্ত হস্তে অর্থ সাহায্যে এগিয়ে আসেন। প্রতিষ্ঠার পর থেকে মহারাণী স্বর্ণময়ী দেবীর আনুকূল্যে কলেজটি লালিত-পালিত হয়েছে। যখনই কলেজের কোন সংকট দেখা দিয়েছে, তা নিরসনে বিন্দুমাত্র বিলম্ব না করে এগিয়ে এসেছেন তিনি। বহরমপুর কলেজের সংকটময় মুহূর্তে ব্রিটিশ সরকার কলেজটিকে দ্বিতীয় শ্রেণিভুক্ত করে দেয়। তৎক্ষণাৎ রাণী স্বর্ণময়ী ২০ হাজার টাকা দিয়ে একে পুনরায় প্রথম শ্রেণির কলেজে উন্নীত

*অতিথি শিক্ষক, পলাশী কলেজ।

করেন।[৫] ১৯০৩ সালে বহরমপুর কলেজের নতুন নাম রাখা হয় 'কৃষ্ণনাথ কলেজ'। আর এই কৃষ্ণনাথ কলেজকে কেন্দ্র করেই মুর্শিদাবাদ জেলা বিজ্ঞান আন্দোলনের প্রেক্ষাপট গড়ে উঠেছিল।

আমরা যদি জেলার অতীত ইতিহাসের দিকে দৃষ্টি ঘোরাই, তাহলে দেখা যাবে যে, বেশ কিছু বিজ্ঞান পৃষ্ঠপোষক মানুষের আবির্ভাব হয়েছিল জেলাতে। তাঁরা প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষভাবে বিজ্ঞানের সাহায্যার্থে তাদের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। এই রকম একজন ব্যক্তি হিসাবে কাশিমবাজারের মহারাজা কৃষ্ণনাথের নাম পাই। তাঁর উল্লেখ ইতিপূর্বে করা হয়েছে। যেখানে মহারাজা কৃষ্ণনাথের মধ্যে আধুনিক চিন্তাভাবনার পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে, সেখানে তাঁর অর্ধাঙ্গিনী মহারাণী স্বর্ণময়ীর উপর বিজ্ঞানচেতনার প্রভাব পড়বে না, তা কখনো হয়! মহারাণী স্বর্ণময়ী প্রত্যক্ষভাবে কোনো বিজ্ঞানের সংগঠন গড়ে তোলেননি। কিন্তু বিজ্ঞানের অগ্রগতির ক্ষেত্রে তাঁর অবদান স্মরণীয় হয়ে রয়েছে। মহারাণী স্বর্ণময়ী খ্যাত হয়ে আছেন তার অকৃত্রিম দানের জন্য। তিনি মোট ৭০ লক্ষ টাকা দান করেন।[৬] তাঁর এই বিপুল দানের বেশির ভাগ অংশ হল বিভিন্ন শিক্ষাখাতে অর্থ সাহায্য করা। তিনি কলকাতায় মেডিক্যাল কলেজ নির্মাণের জন্য দেড় লক্ষ টাকা সাহায্য করেন।[৭] স্ত্রীশিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে তিনি যথেষ্ট যত্নবান ছিলেন। দেশীয় স্ত্রীলোকেদের শিক্ষার জন্য বিভিন্ন খাতে তিনি তিন হাজার টাকা দেন। রাণী স্বর্ণময়ীর আধুনিক চিন্তার পরিচায়ক হল নারীদের চিকিৎসাবিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়ার জন্য মুর্শিদাবাদে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার চিন্তাভাবনা করা, যেখানে মহিলাদের চিকিৎসাবিজ্ঞান পড়ানো হবে।[৮] কিন্তু মফঃস্বল এলাকায় তা সম্ভবপর নয় ভেবে, তিনি দেড় লক্ষ টাকা ব্রিটিশ সরকারের হাতে তুলে দেন। শর্ত যেসমস্ত মহিলা চিকিৎসাবিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করবে, ওই অর্থ তাঁদের বৃত্তি হিসেবে দেওয়া হবে। তৎকালীন সময়ে যেখানে নারীদের শিক্ষা লাভের সুযোগ ছিল সীমিত, সেখানে মহারানীর এই উদ্যোগ নিঃসন্দেহে বিজ্ঞানমনস্কতার পরিচয় বহন করে। জাতীয় বিজ্ঞানচর্চার জন্য মহেন্দ্রলাল সরকার ১৮৭৬ সালে প্রতিষ্ঠা করেন 'ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশান ফর দি কালটিভেশন অফ সায়েন্স' (Indian Association for the cultivation of science)। এই সংগঠনটিতে অর্থ সাহায্যে এগিয়ে আসেন স্বর্ণময়ী; তিনি পাঁচ হাজার টাকা অনুদান দেন।[৯] তাঁর সাহচর্যে লালিত-পালিত হয়েছিল বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজ। মূলত স্বর্ণময়ীয় সাহায্যের ফলেই কলেজটি অবলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিল। মুর্শিদাবাদ জেলাবাসীর মধ্যে বিজ্ঞানের ভাবধারা বিকাশে তথা জেলায় বিজ্ঞান আন্দোলনের ক্ষেত্রে কৃষ্ণনাথ কলেজ সবসময় পথ প্রদর্শকের ভূমিকা পালন করে এসেছে।

কাশিমবাজার রাজপরিবারের আরও দুজন বিজ্ঞান মনোভাবাপন্ন ব্যক্তি হলেন মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী (১৮৬০-১৯২৯) ও তাঁর পুত্র শ্রীশচন্দ্র নন্দী (১৮৯৭-১৯৫২)। স্বর্ণময়ীর মৃত্যুর পর তাঁর সম্পত্তির মালিক হন মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী। তিনি শিক্ষা, চিকিৎসা ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রেও বিপুল অর্থ দান করেছিলেন। বিজ্ঞানের অগ্রগতির লক্ষ্যে বসু বিজ্ঞান মন্দিরকে তিনি দুই লক্ষ টাকা দিয়ে সাহায্য করেন।[১০] তাঁর দানের বহর এতো ছিল যে, তিনি দানবীর মহারাজা হিসাবেও পরিচিত ছিলেন।[১১] শিক্ষা বিস্তারের জন্য তাঁর সর্ব মোট দানের পরিমাণ ছিল ১,৬২, ১১২ টাকা। সমাজের, দেশের মঙ্গলের জন্যই তাঁর এই অর্থ দান। তা না হলে, কেন একজন ব্যক্তি শিক্ষা বিস্তারের জন্য, বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য তাঁর ধনরাশি অকাতরে বিলিয়ে যাবেন! মনীন্দ্রচন্দ্র মনে-প্রাণে চাইতেন বাংলাতে বিজ্ঞানের অগ্রগতি ত্বরান্বিত হোক। কিন্তু সে কাজে বাধা হয়ে দাঁড়াত অর্থ। একজন মানুষের পক্ষে কতই বা সাহায্য করা সম্ভব। কিন্তু বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য তাঁর হাত সর্বদা এগিয়ে থাকতো। তাই কৃষ্ণনাথ কলেজে পদার্থবিজ্ঞানে 'অনার্স কোর্স' চালু করার জন্য তিনি উদ্যোগ নেন এবং সেই মতো বিজ্ঞানের পরীক্ষাগারে ব্যবহারের জন্য মূল্যবান যন্ত্রপাতি ক্রয় করেন। কিন্তু পদার্থবিদ্যায় অনার্স কোর্সের প্রস্তাব বাতিল হয়ে যায়। ঠিক এই সময় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে নিযুক্ত হন আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। তিনি একটি বিজ্ঞান কলেজ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেন। বিভিন্ন উৎস থেকে অর্থ সংগ্রহের পর, গৃহনির্মাণ করা হয়। কিন্তু বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির অভাব, সেই প্রয়াসে বাধা হয়ে দাড়ায়। আশুতোষ মুখোপাধ্যায় জানতে পারেন যে, কাশিমবাজারের মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী কৃষ্ণনাথ কলেজে বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য বেশকিছু যন্ত্রপাতি কিনেছিলেন। তাই আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের অনুরোধে মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী সেই যন্ত্রপাতি কলকাতার বিজ্ঞান কলেজকে দান করেন। মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর এই পদক্ষেপ তাঁর বিজ্ঞানপ্রীতির পরিচয় দেয়।[১২] প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য যে, বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলন প্রথম অনুষ্ঠিত হয় বাংলা ১৩১৪ সনের ১৭ ও ১৮ কার্ত্তিক কাশিমবাজার রাজবাড়িতে।[১৩] এই সম্মেলন।র অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি ছিলেন মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী।

কাশিমবাজার রাজবাড়ির পরবর্তী উত্তরাধিকারী হন মণীন্দ্রচন্দ্রের পুত্র শ্রীশচন্দ্র নন্দী। শ্রীশচন্দ্রের প্রাথমিক শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় কৃষ্ণনাথ কলেজ স্কুল থেকে। তিনি বি.এ পাশ করেন বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজে। তিনি কলা বিভাগের ছাত্র ছিলেন। কিন্তু বিজ্ঞান সম্পর্কে জ্ঞান আহরণের জন্য বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপকদের সঙ্গে মেলামেশা করতেন।[১৪] তিনি মনে করতেন সমাজের, দেশের উন্নতির জন্য বিজ্ঞানের প্রয়োগ অপরিহার্য। শিল্পকে, দেশকে সমৃদ্ধ করার জন্য বিজ্ঞানের ব্যবহার করা প্রয়োজন। তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন, দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা দূরীকরণে বিজ্ঞানের প্রয়োগ আবশ্যক। বিজ্ঞানের সুযোগ-সুবিধা কিভাবে গ্রহণ করা যায় তার চিন্তাভাবনা তিনি করতেন।[১৫] তিনি নিরন্তর চিন্তাভাবনা করতেন, কিভাবে বাংলার বুজে যাওয়া নদীগুলিকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে পুনরায় চলাচলের উপযোগী করা যায়।[১৬] মন্ত্রিত্ব পদ পাওয়ার পর শ্রীশচন্দ্র নন্দী সর্বপ্রথম বৈজ্ঞানিক উপায়ে নদী নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনার চেষ্টা শুরু করেন এবং বাংলার নদী অঞ্চলের জমির ঢালের জরিপের ব্যবস্থা করা হয়। তাঁর নদী সম্পর্কিত দুটি গ্রন্থ হল — 'বাংলার নদী সমস্যা' এবং 'বন্যা ও তাহার প্রতিকার'।[১৭] ফলত সমাজের অগ্রগতির জন্য তাঁর বিজ্ঞানভাবনা জেলার শুভ্যানুধ্যায়ী ব্যক্তিদের মনে রেখাপাত করবে, তা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই।

মুর্শিদাবাদের ভূমিসন্তান রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর (১৮৬৪-১৯১৯) বিজ্ঞানচর্চা জেলার জনসমাজে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল, যদিও তাঁর মূল কর্মক্ষেত্র ছিল কলকাতাকেন্দ্রিক। ১৮৬৪ সালের ২০ আগস্ট রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর জন্ম। গ্রামের ছাত্রবৃত্তি পাঠশালায় তাঁর হাতেখড়ি হয়। ১৮৭৬ সালে তিনি কান্দী ইংরেজি পাঠশালায় ভর্তি হন। এর পরবর্তী পঠনপাঠন থেকে মূল কর্মক্ষেত্র সব কলকাতার মধ্যেই ছিল। ১৮৯২ সালে তিনি রিপন কলেজে পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়নশাস্ত্রের অধ্যাপক হিসেবে নিযুক্ত হন।[১৮] এখানে তাঁর মাতৃভাষা বাংলায় বিজ্ঞানচর্চা ছাত্রসমাজে বিজ্ঞান সম্পর্কে আগ্রহের সঞ্চার করে। মাতৃভাষা বাংলায় বিজ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। কিন্তু মুর্শিদাবাদ জেলার মানুষের মধ্যে বিজ্ঞান চেতনার প্রসারে তাঁর অবদান নিতান্তই গৌণ।

১৯৬০ এর দশকে সতেন্দ্রনাথ বসু কৃষ্ণনাথ কলেজে আসেন এবং জনপ্রিয় বিজ্ঞান বক্তৃতার মধ্যে দিয়ে বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণ সম্পর্কে এই কলেজের অধ্যাপকগণকে আকৃষ্ট করেন।[১৯] এর ফলে কলেজের অধ্যাপকসহ ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বিজ্ঞান নিয়ে আগ্রহ বৃদ্ধি পায়। শুরু হয় বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণের কাজ এবং এর পরিধি কলেজের চত্বর ছাড়িয়ে মুর্শিদাবাদ জেলার বিভিন্ন এলাকায় বিস্তার লাভ করে।

১৯০৭ সালে প্রথম বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল কাশিমবাজার রাজবাড়িতে। এই সম্মেলনের অন্যতম তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।[২০] ১৩২০ বঙ্গাব্দে কলকাতার টাউন হলে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের সপ্তম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে বিজ্ঞান বিভাগের সভাপতি হন রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।[২১] বিজ্ঞান নিয়ে তাঁর চিন্তাভাবনা, মতাদর্শ এবং মাতৃভাষা বাংলায় বিজ্ঞানচর্চা মুর্শিদাবাদ জেলার শিক্ষিত মহলে যথেষ্ট আলোড়ন ফেলেছিল। মুর্শিদাবাদ জেলার সন্তান রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী বিজ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে ইতিহাসে নিজের যে অবদান রেখেছেন, তা জেলার বিদ্বান সমাজকে অনুপ্রাণিত করেছিল। এর স্বাক্ষর জেলার বিভিন্ন বিজ্ঞান পত্রিকায় পাওয়া যায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, জেলার বিজ্ঞান পত্রিকা 'এবং কি কে ও কেন' তে তিনটি রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল।[২২]

উপরোক্ত বক্তব্যগুলি পরোক্ষভাবে জেলার বিজ্ঞান আন্দোলনের পটভূমি গড়ে তুলতে সাহায্য করেছিল। ১৯৭০-এর দশক থেকে বিজ্ঞান আন্দোলন তার পরিপূর্ণ রূপ ধারণ করে মানুষের মধ্যে বিজ্ঞানমনস্কতার বিকাশ ঘটানোর প্রয়াস করে চলেছে। তবে মুর্শিদাবাদ জেলায় বিজ্ঞান আন্দোলনের প্রেক্ষাপট ১৯৪৭ সালের পরবর্তী সময় থেকেই লক্ষ্য করা যায়। স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে বাংলার সাথে সাথে মুর্শিদাবাদে জেলাতেও উদ্বাস্তু সমস্যা, খাদ্য সংকট, চিকিৎসার অভাব দেখা দেয়।[২৩] আমরা যদি জেলার আর্থ-সামাজিক অবস্থার দিকে দৃষ্টি ঘোরাই তাহলে দেখব যে, শিক্ষার দিক থেকে এই জেলা অনেকটাই পিছিয়ে। পরিসংখ্যান দেখলে মুর্শিদাবাদ জেলায় শিক্ষার অগ্রগতির করুণ চিত্র পরিস্ফুট হয়। ১৯৫০-৫১ সালে জেলার সাক্ষরতার হার ছিল মাত্র ১২.৬৮ শতাংশ।[২৪] পুরুষ ও নারীর মধ্যে শিক্ষার ব্যবধান আরও বিস্তর। এপ্রসঙ্গে একটু পরিসংখ্যানের দিকে নজর দেওয়া যাক।

মুর্শিদাবাদ জেলার সাক্ষরতার হার (শতাংশে)

সাল	মোট	পুরুষ	নারী
১৯৫১	১২.৬৮	১৯.০৬	৬.০৮
১৯৬১	১৬.০৩	২৩.৪৯	৮.৩৯
১৯৭১	১৯.৬৬	২৬.৭৩	১২.২৬
১৯৮১	২৪.৮৯	৩১.৭৫	১৭.৭৫
১৯৯১	৩৮.৩৮	৪৬.৪২	২৯.৫৭
২০০১	৫৫.০৭	৬১.৪০	৪৮.৩৩

সূত্র : মুর্শিদাবাদ জেলা গেজেটিয়ার[২৫]

সুতরাং উপরের পরিসংখ্যান থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, জেলার শিক্ষা ব্যবস্থার দৈন্য দশা। সালের প্রেক্ষিতে সাক্ষরতার হারের অগ্রগতি ঘটলেও, নারীরা তুলনামূলকভাবে অনেকটায় পিছিয়ে। আবার গ্রাম ও শহরের মানুষের মধ্যে সাক্ষরতার হারের মধ্যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে। ১৯৫১ সালে গ্রামীণ অঞ্চলে সাক্ষরতার শতকরা হার ছিল ১০.৬৬% এবং শহরে ছিল ৩৫.৫২%। ১৯৬১ সালে এই হার দাঁড়ায় — গ্রামে ১৩.৭২% এবং শহরে ৪০.৭৪%।[২৬]

এই পরিসংখ্যান উল্লেখ করার কারণ হল জেলার সামগ্রিক শিক্ষার চিত্রটি তুলে ধরা। মানুষের মধ্যে যদি শিক্ষার আলো না পৌঁছায়, তাহলে সহজেই তারা অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কারে বিশ্বাসী হয়ে উঠবে। যুক্তিবোধ তৈরি করা, চিন্তাভাবনার বিকাশ ঘটানোর জন্য শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। মানুষ যখন মনের জানলা খুলে দিয়ে জ্ঞানের প্রসারতা বাড়ায়, তখন তার বুদ্ধির বিকাশ ঘটে এবং যুক্তিপূর্ণ মননশীলতা গড়ে ওঠে। তখনই মানুষের বিজ্ঞানমনস্কতার পরিচয় পাওয়া যায়। ফলত জেলার মানুষের মধ্যে বিজ্ঞানমনস্কতার বিকাশ ঘটানোর জন্য মানুষকে শিক্ষিত করে তোলা একান্তভাবেই প্রয়োজন। আর এই লক্ষ্য পূরণে এগিয়ে এসেছে বিজ্ঞান আন্দোলন।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়(১৮৩৮-১৮৯৪), রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী(১৮৬৪-১৯১৯), মেঘনাদ সাহা (১৮৯৩-১৯৫৬) প্রমুখ ব্যক্তি বিজ্ঞানকে মাতৃভাষায় প্রচারের মাধ্যমে জনপ্রিয়করণের চেষ্টা করেন। সাংগঠনিকভাবে বিজ্ঞানকে সমাজের সবার কাছে পৌঁছে দেওয়ার কাজটি করে বিজ্ঞান ক্লাব। তারা তাদের কর্মসূচির মধ্যে আকাশ পর্যবেক্ষণ, মডেল নির্মাণ, বিজ্ঞান প্রদর্শনী, আলোচনাসভা ইত্যাদির মাধ্যমে মানুষের কাছে বিজ্ঞানের গ্রহণযোগ্যতা বাড়ানোর চেষ্টা করে। প্রয়োজনে পত্রিকা-পুস্তিকা প্রকাশের মধ্যে দিয়ে চলে বিজ্ঞানকে সর্বসাধারণের কাছে পৌঁছে দেওয়ার কাজ। সেই উদ্দেশ্য নিয়ে প্রথমে ১৯৪০-এ নীহার মুন্সী, রণেন ঘোষ প্রমুখের উদ্যোগে গড়ে উঠে 'সায়েন্স ক্লাব'।[২৭] এই বিজ্ঞান ক্লাব প্রতিষ্ঠার ঢেউ, ধীরে ধীরে সমাজে বিজ্ঞানমনস্ক ব্যক্তিগণকে উজ্জীবিত করে তোলে। তার ফলে ১৯৪০ এর দশক থেকেই পশ্চিমবঙ্গে বিজ্ঞান আন্দোলনের ক্ষেত্র তৈরি হয়ে যায়। একই কথা প্রযোজ্য মুর্শিদাবাদ জেলার ক্ষেত্রেও। কারণ বিজ্ঞান ক্লাব বা বিজ্ঞান সংগঠনের মধ্যেই নিহিত ছিল জেলার বিজ্ঞান আন্দোলনের চিত্র।

১৯৪৮ সালে আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু প্রতিষ্ঠা করেন 'বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ'। মানুষের মধ্যে কুসংস্কার দূরীকরণ, মাতৃভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞানের প্রসার ঘটানো, বিজ্ঞান নিয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি পাশাপাশি বিজ্ঞানকে সর্বসাধারণের উন্নতির জন্য প্রয়োগ করা প্রভৃতি লক্ষ্য নিয়ে এই সংগঠনটি যাত্রা শুরু করে।[২৮] প্রকাশ লাভ করে বাংলা বিজ্ঞান পত্রিকা 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান'। বিজ্ঞানের সংগঠন গড়ে তোলার ঢেউ মুর্শিদাবাদে পৌঁছাতে খুব বেশি দেরি হয়নি। সেই ঢেউ প্রথম প্লাবিত করেছিল বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজকে। কারণ কৃষ্ণনাথ কলেজে বিজ্ঞানের অধ্যাপকদের মধ্যে বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণের যে আবহাওয়া তৈরি হয়েছিল, তার মূলে ছিলেন আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু। গুরুশিষ্য পরম্পরায় বিজ্ঞানমনস্কতার বিকাশ ঘটেছিল কৃষ্ণনাথ কলেজে। এই কলেজের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন অমূল্যচরণ গুহ। তিনি আবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর ছাত্র ছিলেন।[২৯] কৃষ্ণনাথ কলেজে অধ্যাপক হিসেবে যোগদানের আগে অমূল্যচরণ গুহ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশান ফর দি কালটিভেশন অব সায়েন্সে কিছু সময় বিজ্ঞান গবেষণার কাজে যুক্ত ছিলেন।[৩০] যাইহোক ১৯৬০র দশকে আচার্য বসু বহুবার বহরমপুরে আসেন[৩১] এবং অমূল্যচরণ গুহের আমন্ত্রণে তিনি অনেকবার কৃষ্ণনাথ কলেজ এসে জনপ্রিয় বিজ্ঞান বক্তৃতার

মাধ্যমে কলেজের অন্যান্য অধ্যাপকগণকে বিজ্ঞান সম্পর্কে আগ্রহ বৃদ্ধি করেন। ফলত অমূল্যচরণ গুহ বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণের কাজে সহযোদ্ধা হিসেবে পাশে পেয়েছিলেন অধ্যাপক জিতেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সুশীলকুমার সেন ও হিমাংশু শেখর ঘটক (জিয়াগঞ্জ শ্রীপৎ কলেজের অধ্যাপক ও কৃষ্ণনাথ কলজের প্রাক্তন ছাত্র) প্রমুখকে। পরবর্তী সময়ে তাদের ছাত্রছাত্রী অলোক সেন, পূর্ণেন্দু সেন, ঈপ্সিতা গুপ্ত, পার্থসখা বসু, সুব্রত সরকার, প্রকাশদাস বিশ্বাস প্রমুখ বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণ তথা বিজ্ঞান আন্দোলনের কাজকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছেন।

পার্থসখা বসু তাঁর 'বহরমপুরে বিজ্ঞানচর্চা' প্রবন্ধে জানাচ্ছেন যে, ১৯৪৭ সালে বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজে যে বিজ্ঞান প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছিল, তা জেলার মধ্যে আলোড়ন ফেলেছিল।[৩২] পদার্থবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা ও রসায়নবিদ্যা বিভাগ মিলিত হয়ে যে বিজ্ঞান প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিল, তা জেলার প্রথম গণবিজ্ঞান মেলা বলা যেতে পারে। এবার প্রশ্ন হচ্ছে যে, ১৯৪৭ সালে কেন কৃষ্ণনাথ কলেজে বিজ্ঞান মেলা অনুষ্ঠিত হল? এক্ষেত্রে অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ ১৯৪৬ সালে অমূল্যচরণ গুহর কৃষ্ণনাথ কলেজে পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক হিসেবে যোগদান।[৩৩] ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণের কাজটি তিনিই প্রথম শুরু করেন। ১৯৪৭ সালে ডিসেম্বর মাসে কৃষ্ণনাথ কলেজে পদার্থবিজ্ঞানের আরেকজন অধ্যাপক হিসেবে যোগদান করেন জিতেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। যিনি অমূল্যচরণ গুহের বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণের সহযোদ্ধা ছিলেন। পরবর্তী সময়ে কৃষ্ণনাথ কলেজে দ্বিতীয় বিজ্ঞান প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়েছিল।[৩৪] এই বিজ্ঞান প্রদর্শনীতে বেঙ্গল কেমিক্যাল এবং ক্যালকাটা কেমিক্যাল সাহায্য করেছিল বলে জানা যায়।[৩৫] কিন্তু কত সালে দ্বিতীয় বিজ্ঞান প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়েছিল জানা যায়না।

কৃষ্ণনাথ কলেজে বিজ্ঞান প্রদর্শনীর সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে বহরমপুর টেক্সটাইল কলেজ বাৎসরিক বিজ্ঞান প্রদর্শনী চালু করে। এই প্রদর্শনীতে গুটি পোকার জীবনবৃত্তান্ত থেকে রেশম সুতো তৈরি হতো এবং কিভাবে সিল্কের কাপড় বোনা হয়, তা দেখানো হতো।[৩৬] এই দুই কলেজের বিজ্ঞান প্রদর্শনীতে প্রচুর মানুষের সমাগম হতো, যা জেলার বিজ্ঞান আন্দোলনের কাজকে একধাপ এগিয়ে দিয়েছিল।

একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, কৃষ্ণনাথ কলেজের অধ্যাপকদের মধ্যে বিজ্ঞান মনন গড়ে তোলার প্রাথমিক কাজটি করেছিলেন সতেন্দ্রনাথ বসু। কৃষ্ণনাথ কলেজে সোশ্যাল অনুষ্ঠানে তিনি বহুবার এসেছেন এবং থেকেছেন কাশিমবাজার রাজবাড়িতে।[৩৭] অনুমান করা যায় যে, এমন একজন জাতীয় অধ্যাপক মুর্শিদাবাদে এলে জেলার শিক্ষিত মানুষেরা তাঁর সাহচর্য পাওয়ার চেষ্টায় সদা প্রস্তুত থাকবে। এমনকি আচার্য বসুর মাতৃভাষা বাংলায় বিজ্ঞান প্রচার ও বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণের কাজ জেলার বিজ্ঞানমনস্ক মানুষদের আগ্রহী করে তুলেছিল। আচার্য সতেন্দ্রনাথ বসুর বিজ্ঞানচর্চা কলেজের অধ্যাপকদের কতটা অনুপ্রাণিত করেছিল তার প্রত্যক্ষ একটি দৃষ্টান্ত হল জেলার প্রথম বিজ্ঞানের সংগঠন 'মুর্শিদাবাদ জেলা বিজ্ঞান পরিষদ' (১৯৭২) প্রতিষ্ঠা। এই সংগঠনটির প্রতিষ্ঠাতাগণ প্রথমে চেয়েছিলেন বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের শাখা হিসেবে কাজ করতে।[৩৮] যদিও পরে একটি স্বতন্ত্র সংগঠন হিসেবেই এটি যাত্রা শুরু করে। তবে অনুমান করা যায় যে, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের আদলে সংগঠনটির নামের শেষ দুটি শব্দ 'বিজ্ঞান পরিষদ' রাখা হয়। ফলত বোঝা যাচ্ছে, মুর্শিদাবাদ জেলার বিজ্ঞান আন্দোলনের ক্ষেত্র তৈরিতে আচার্য সতেন্দ্রনাথ বসুর অবদান ইতিহাসে অনেক বড় জায়গা জুড়ে রয়েছে। এই বিজ্ঞান আন্দোলনের ফলে মুর্শিদাবাদ জেলায় 'মুর্শিদাবাদ জিলা বিজ্ঞান পরিষদ' (১৯৭০), 'বিজ্ঞান শিক্ষার্থী সংঘ' (১৯৮১), 'বিজ্ঞান ভাবনা' (১৯৯৫) প্রভৃতি সংগঠন গড়ে উঠেছে। সংগঠনের মুখপত্র হিসেবে বা কয়েকজন ব্যক্তির প্রচেষ্টায় প্রকাশিত হয়েছে বিজ্ঞানের পত্রিকা। এইরকম কিছু বিজ্ঞান পত্রিকা হল — 'বিজ্ঞান জিজ্ঞাসা', 'এবং কি কে ও কেন', 'বিজ্ঞান ভাবনা' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। মূলত বিজ্ঞান সংগঠন ও পত্রিকাগুলি মুর্শিদাবাদ জেলায় বিজ্ঞান আন্দোলনের ধারাকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছে।

সূত্রনির্দেশ ও টীকা

১. সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায়, বিজ্ঞান যখন আন্দোলন, সেতু প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১৮, পৃ. ২।
২. আশীষ কুমার মণ্ডল, মুর্শিদাবাদ জেলায় খ্রিস্টান মিশনারীদের কার্যকলাপ, শিল্পনগরী, মুর্শিদাবাদ, ২০১৪, পৃ.২১।
৩. বিষাণ কুমার গুপ্ত, 'মুর্শিদাবাদ জেলায় শিক্ষা ব্যবস্থার ক্রমবিকাশের প্রেক্ষাপটে শহর বহরমপুর (১৭০৪-১৯৫৪)', ইতিহাসের আলোকে বহরমপুর পৌরসভা, বহরমপুর পৌরসভা, বহরমপুর, ২০০৮, পৃ. ৬৬।
৪. তদেব।

৫. শ্রীকমল চৌধুরী, 'মহারাণী স্বর্ণময়ী', কৃষ্ণনাথ কলেজ ১৫০ বছর কম্মেমোরেশন ভলিউম (১৮৫৩-২০০৩), কৃষ্ণনাথ কলেজ, বহরমপুর, পৃ. ২৩৯।
৬. কমল চৌধুরী, মুর্শিদাবাদের ইতিহাসঃ প্রথম পর্ব, দে'জ প্রকাশনী, কলকাতা, পুর্নমুদ্রণ, ২০১৫, পৃ. ৮০১।
৭. তদেব।
৮. শ্রীকমল চৌধুরী, 'মহারাণী স্বর্ণময়ী', তদেব, পৃ. ২৩৮।
৯. পবিত্র দাস, 'পাশ্চাত্য বিজ্ঞানচর্চার ভারতীয় পথিকৃৎ ডঃ মহেন্দ্রলাল সরকার', এবং কি কে ও কেন, অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০০১, পৃ. ১৪।
১০. কমল চৌধুরী, মুর্শিদাবাদের ইতিহাসঃ প্রথম পর্ব, পৃ. ৮০৫।
১১. তদেব, পৃ. ৮০২।
১২. অরূপরতন ভট্টাচার্য, বাঙ্গালীর বিজ্ঞান ভাবনা ও সাধনা, দে'জ প্রকাশনী, কলকাতা, ২০০৬, পৃ. ৩৯৭।
১৩. 'আলোকপাত', ঝড়, সাহিত্যপত্র, জুন ২০১২, পৃ. ১২৬।
১৪. প্রতিভারঞ্জন রায়, 'মহারাজ শ্রীশচন্দ্র ও কৃষ্ণনাথ কলেজ', কৃষ্ণনাথ কলেজ ১৫০ বছর কম্মেমোরেশন ভলিউম (১৮৫৩-২০০৩), কৃষ্ণনাথ কলেজ, বহরমপুর, পৃ. ২৫৯।
১৫. তদেব।
১৬. তদেব, পৃ. ২৬১।
১৭. তদেব।
১৮. প্রকাশ দাস বিশ্বাস, মুর্শিদাবাদের মনীষী, আকাশ প্রকাশনী, বহরমপুর, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০০৬, পৃ. ৬৬।
১৯. পূর্ণেন্দু সেন, 'অলোক সেন', এবং কি কে ও কেন, এপ্রিল-জুন ২০১৩, পৃ. ১৯।
২০. আলোকপাত, তদেব, পৃ. ১২৬।
২১. অরূপরতন ভট্টাচার্য, তদেব, পৃ. ৪৮৪।
২২. রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী সংখ্যা (এক) এবং কি কে ও কেন, জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১৪।
রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী সংখ্যা (দুই), এবং কি কে ও কেন, জানুয়ারী-মার্চ ২০১৫।
রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী সংখ্যা (তিন), এবং কি কে ও কেন, জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১৫।
২৩. এবং কি কে ও কেন, এপ্রিল-জুন ২০০৮, পৃ. ২২।
২৪. বিষাণ কুমার গুপ্ত, তদেব, পৃ. ৬৮।
২৫. বিজয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও অন্যান্য, মুর্শিদাবাদ জেলা গেজেটিয়ার, মুর্শিদাবাদ, ২০০৩, পৃ. ৪১২।
২৬. বিষাণ কুমার গুপ্ত, তদেব।
২৭. সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায়, 'বিজ্ঞান ক্লাব বিজ্ঞান চেতনা বিজ্ঞান আন্দোলন', উৎস মানুষ, জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী ২০০০, পৃ. ১২।
২৮. প্রবীর ঘোষ ও বিপ্লব দাস, বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ইতিহাস, দে'জ প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১৪, পৃ. ৪৬।
২৯. অমূল্যচরণ গুহ, 'আচার্য সতেন্দ্রনাথ বসু', প্রাক্তনী, কৃষ্ণনাথ কলেজ, বহরমপুর, ২০০৩, পৃ. ৪১।
৩০. সুব্রত সরকার, 'অধ্যাপক অমূল্যচরণ গুহকে শতোত্তর প্রণাম', এবং কি কে ও কেন, এপ্রিল-জুন ২০১১, পৃ. ৩০।
৩১. পূর্ণেন্দু সেন, তদেব।
৩২. পার্থসখা বসু, 'বহরমপুরে বিজ্ঞানচর্চা', বিষাণ কুমার গুপ্ত (সম্পা.), ইতিহাসের আলোকে বহরমপুর পৌরসভা, বহরমপুর পৌরসভা, বহরমপুর, ২০০৮, পৃ. ২১১।
৩৩. সুব্রত সরকার, তদেব, পৃ. ৩০।
৩৪. পার্থসখা বসু, তদেব।
৩৫. তদেব।
৩৬. তদেব।
৩৭. অমূল্যচরণ গুহ, তদেব, পৃ. ৪৩।
৩৮. প্রকাশ দাস বিশ্বাস, 'মুর্শিদাবাদ জেলার গণবিজ্ঞান আন্দোলনে মুর্শিদাবাদ জেলা বিজ্ঞান পরিষদের ভূমিকাঃ একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা', এবং কি কে ও কেন, জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০০২, পৃ. ৫৯।

ইতিহাস চর্চা-২

দ্বিতীয় খণ্ড

জনপ্রিয় সংস্কৃতি

(অর্ন্তশৃঙ্খলা সমন্বিত ষাণ্মাসিক বিশেষজ্ঞ শংসায়িত ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থ)

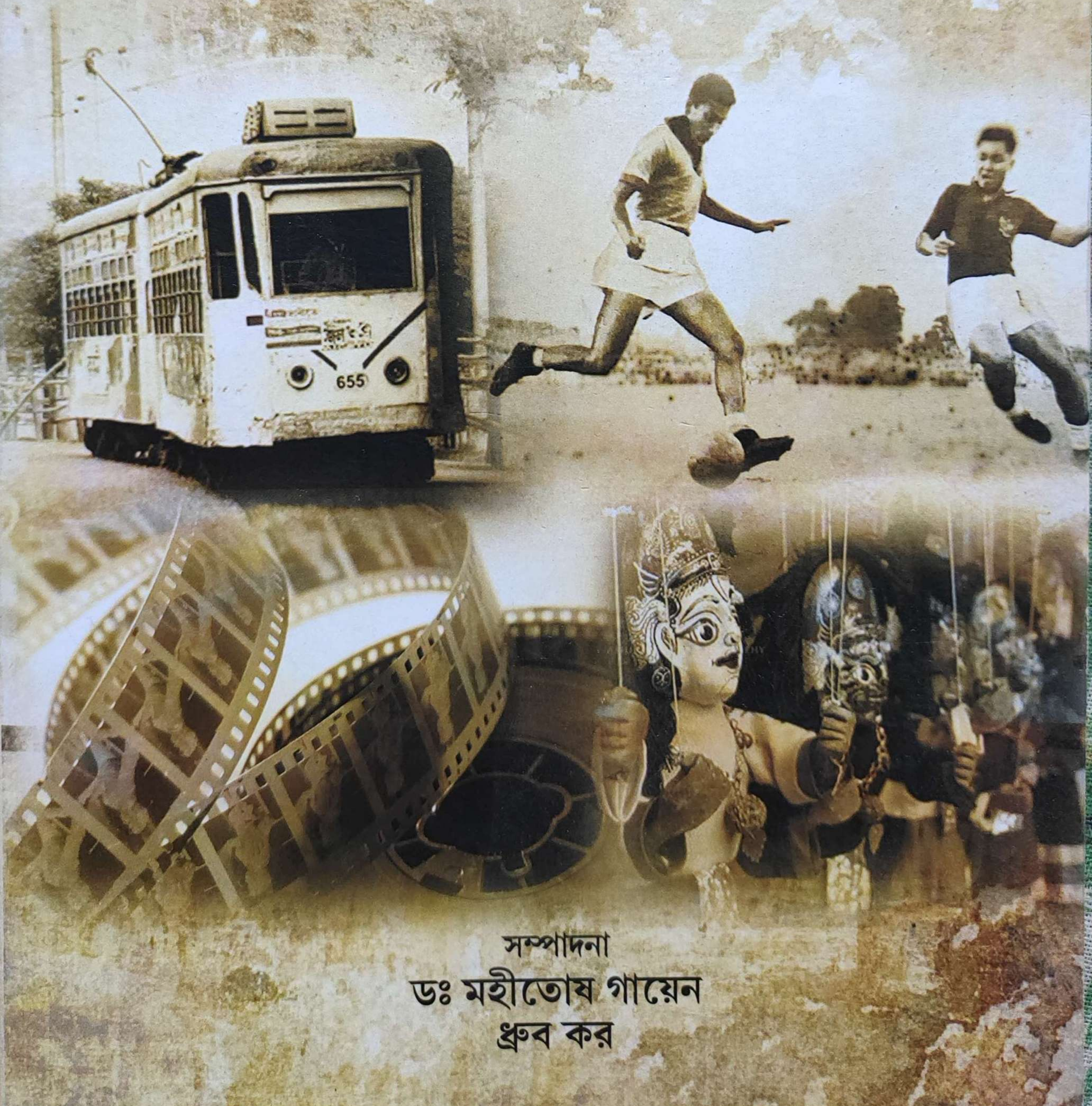

সম্পাদনা
ডঃ মহীতোষ গায়েন
ধ্রুব কর

ITIHAS CHARCHA (DUI)

Edited By Dr. Mahitosh Gayen & Dhruba Kar

Published by Surjendu Bhattacharya, Rupali, Subhaspally, Khalisani Chandannagar-712138. Outlet 206 Bidhan Sarani, Kolkata-700 006

প্রথম প্রকাশ

জুন, ২০২১

গ্রন্থস্বত্ব : ধ্রুব কর

(লেখকের লিখিত অনুমতি ছাড়া এই গ্রন্থের কোনো অংশেরই কোনো প্রকার প্রতিলিপি অথবা যে-কোনো রকমের পুনরুৎপাদন করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘন করা হলে প্রয়োজনীয় আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।)

প্রকাশক

রূপালী

সূর্যেন্দু ভট্টাচার্য

সুভাষপল্লী, পো: খালিসানী, চন্দননগর ৭১২১৩৮

থেকে প্রকাশিত

প্রাপ্তিস্থান: ২০৬ বিধান সরণি, কলকাতা ৭০০ ০০৬

ফোন : ৯৪৩২০৬২৯২৮

অক্ষরবিন্যাস

এল.আর.ইনফোটেক

৫৮ শ্রীরামপুর রোড (নর্থ), গড়িয়া। কলকাতা- ৭০০ ০৮৪

মুদ্রণ

নিউ কালীমাতা প্রিন্টার্স

১৯/এ/এইচ/২ গোয়াবাগান স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০৬

প্রচ্ছদ : সুদীপ্ত জানা

ISBN- 978-93-81669-83-9

মূল্য

২০০ টাকা

সূচীপত্র

অবিভক্ত বাংলার লোকধর্ম ও তাদের গান ১৩
দীপঙ্কর ঘোষ

বাংলা সাহিত্যে দেশভাগ, সাম্প্রদায়িকতাও
উদ্বাস্তু জনজীবনের প্রতিফলন ২৩
রিয়া পাল

অর্জুন—একটি কলোনি জীবনের সংগ্রাম ৩৪
শুভজিৎ দাস

বাংলা চলচ্চিত্রের প্রেক্ষিতে মুর্শিদাবাদ জেলা (১৯৩০-১৯৬১) ৪২
শুভেন্দু বিশ্বাস

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার লোকশিল্পসংস্কৃতির ইতিহাসে
দন্ড পুতুলনাচ : একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা ৫২
দীপঙ্কর মন্ডল

শরীর, পোশাক ও ক্ষমতা: বিজ্ঞাপনের আলোকে ঔপনিবেশিক
কলিকাতায় বিলিতি রুচিবোধের স্বরূপ সন্ধান ৫৮
সুমিত কান্তি ঘোষ

ঔপনিবেশিক পূর্ববঙ্গে (বর্তমানে বাংলাদেশ)
ফুটবল ক্লাব সংস্কৃতির প্রসারের সন্ধানে ৬৯
ধ্রুব কর

বাংলা চলচ্চিত্রের প্রেক্ষিতে মুর্শিদাবাদ জেলা (১৯৩০-১৯৬১)

শুভেন্দু বিশ্বাস
কলেজ শিক্ষক, ইতিহাস বিভাগ, পলাশী কলেজ

ভারতের ইতিহাসে মুর্শিদাবাদ একটি ঐতিহাসিক জেলা হিসাবে পরিচিত। নবাবি শাসনের সময় বাংলা সুবার রাজধানী হিসেবে এই জেলার খ্যাতি ছিল সর্ববিদিত। নবাবদের পৃষ্ঠপোষকতায় এই জেলাতে নির্মিত হয়েছিল একাধিক স্থাপত্য সৌধ। যেগুলি আজও স্বমহিমায় উজ্জ্বল। স্থানীয় স্তরে ছিল জমিদারদের প্রাধান্য। যারা ছিলেন সাংস্কৃতিক চর্চার ধারক ও বাহক। দীর্ঘ দিন ধরেই এই জেলা শিল্প, সাহিত্য, নাট্যচর্চায় অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিল। সাংস্কৃতিক জগতে উজ্জ্বল করেছিল জেলার নাম। বাদ যায়নি বাংলা চলচ্চিত্রও। বাংলা সিনেমা বা চলচ্চিত্রের জগতে স্থান করে নিয়েছে এই জেলা। বিভিন্ন সময়ে চলচ্চিত্রে প্রতিফলিত হয়েছে মুর্শিদাবাদের কথা। তৈরি হয়েছে জেলা নির্ভর সিনেমা বা সিনেমাতে উঠে এসেছে ঐতিহাসিক স্থান, চরিত্র ও সমাজের চিত্র। আলোচ্য গবেষণা প্রবন্ধে ১৯৩০ থেকে ১৯৬১ সাল পর্যন্ত মুর্শিদাবাদ জেলা কিভাবে বাংলা চলচ্চিত্রে প্রতিফলিত হয়েছে তার ইতিহাস তুলে ধরার প্রয়াস করা হয়েছে। মুর্শিদাবাদের ব্যক্তিত্ব হিসেবে রাধারানী দেবী অভিনীত প্রথম ছবি ১৯৩০ সালে মুক্তি পায়। তাই এই সময়কালকে গবেষণা প্রবন্ধের সূচনা হিসেবে ধরা হয়েছে। আর ঋত্বিক ঘটকের 'কোমল গান্ধার' (১৯৬১) সিনেমাতে জেলার সামগ্রিক অংশ চিত্রিত হয়েছিল। তাই এই সময়কালের মধ্যেই আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে।

সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে বিকশিত হয়েছে এই জেলার নাট্য, সাহিত্য, শিল্পকলা, লেখক ও বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠীর। জেলার বিশিষ্ট সাহিত্যিকগণ প্রাণবন্ত সাহিত্য সৃষ্টির মাধ্যমে জায়গা করে নিয়েছে বাংলা চলচ্চিত্রে। নাট্যকারগণের অভিনয়ের নৈপুণ্য দর্শক মহলে সমাদৃত হয়েছে। তাই জেলার নাট্য জগত থেকে উঠে এসেছেন একাধিক ব্যক্তিত্ব, যারা দক্ষ শিল্পীর মতো অভিনয় করেছেন চলচ্চিত্রে। বিনোদনের

ক্ষেত্র রূপে মানুষের মননে স্থায়ী জায়গা করে নিয়েছে সিনেমা বা চলচ্চিত্র। এই চলচ্চিত্র তৈরির সাথে যুক্ত বিপুল আয়োজন এবং কলাকুশিলব। অর্থাৎ সাহিত্য, চিত্রকলা, সঙ্গীত, দর্শক, অভিনয়, পরিচালনা, বাণিজ্য, বিপণন, লোকেশন ইত্যাদি। সিনেমায় ব্যবহিত বিভিন্ন স্থান বা লোকেশনের সাথে জড়িয়ে আছে বিশেষ অঞ্চল, প্রকৃতি, স্থাপত্য ও মানুষজন। বাংলা চলচ্চিত্রে তিন রকম ভাবে উঠে এসেছে মুর্শিদাবাদের কথা। এক, মুর্শিদাবাদের ব্যক্তিত্ব ও ঐতিহাসিক চরিত্রকে নিয়ে তৈরি সিনেমা। দুই, জেলার সাহিত্যের আঙ্গিকে বা সাহিত্য নির্ভর চলচ্চিত্র। আর ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক গুরুত্বের প্রয়োজনে সিনেমার স্থান বা লোকেশন হিসেবে উঠে আসতে পারে জেলার কথা।

মুর্শিদাবাদকে প্রথম চলচ্চিত্রের সাথে যুক্ত করেন জিয়াগঞ্জের প্রখ্যাত সঙ্গীতকার রাধারানী দেবী। ১৯১৩ সালে জিয়াগঞ্জে নিজের পৈতৃক বাড়িতে রাধারানী দেবীর জন্ম। প্রথাগত শিক্ষার সুযোগ তাঁর হয়নি। তবে কিশোরী বয়েস থেকে তিনি ছিলেন সুমিষ্ট কণ্ঠের অধিকারিণী। তৎকালীন মুর্শিদাবাদের নবাব বংশজাত ওস্তাদ মঞ্জু সাহেব ছিলেন তার সঙ্গীতের শিক্ষক। জিয়াগঞ্জের নেহালিয়া জমিদার সুরেন্দ্রনারায়ণ সিংহের বাড়িতে বিরাট গানের আসর বসত। এই আসরে গান গাইতে গিয়ে পরিচয় ঘটে কলকাতার কালিকা থিয়েটারের প্রতিষ্ঠাতা রামচন্দ্র চৌধুরীর সঙ্গে। সুযোগ পান রেডিওতে গান করার। গান করা ছাড়াও মঞ্চে নাটক অভিনয় তাঁকে বিখ্যাত করে তোলে। সেই সময়ে গান জানা মহিলাদের সিনেমাতে বিশেষ কদর ছিল। সুমধুর কণ্ঠ ও অভিনয়ের নৈপুণ্য রাধারানী দেবীকে সুযোগ এনে দেয় বাংলা চলচ্চিত্র জগতে পদার্পণ করার। বায়স্কোপের জগতে তিনি প্রবেশ করেন ১৯২৬ সালে। রাধারানী দেবী অভিনীত প্রথম ছবি 'শ্রীকান্ত' মুক্তি পায় ১৯৩০ সালে চিত্রা প্রেক্ষাগৃহ।[১] এটি ছিল নির্বাক চলচ্চিত্র। তাঁর অভিনীত প্রথম সবাক চলচ্চিত্র হল 'দক্ষযজ্ঞ'।[২] সিনেমাটি পরিচালনা করেছিলেন জ্যোতিষ ব্যানার্জী। এরপরে সিনেমা জগতে রাধারানী দেবীর জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পেতে থাকে। তিনি বহু সিনেমাতে অভিনয় করেন। তাঁর অভিনীত সিনেমাগুলি হল মানময়ী গার্লস স্কুল, কণ্ঠহার, গীতা(নির্বাক), মা ও ছেলে, দেবযানী প্রভৃতি। রাধারানী দেবী অভিনীত শেষ ছবি হল 'মায়া কানন'(১৯৫১)।[৩]

অভিনয়ের পাশাপাশি পরিচালকের ভূমিকাতেও দেখা গিয়েছে এই জেলার

নারীকে। এক্ষেত্রে এক উজ্জ্বল নাম হল মঞ্জু দে। ১৯২৬ সালে বহরমপুরে তাঁর জন্ম। শিক্ষার হাতেখড়ি হয় বহরমপুর লন্ডন মিশনারি স্কুল থেকে। পরবর্তী সময়ে বি.এ পড়ার জন্য কলকাতায় আশুতোষ কলেজে ভর্তি হন। কলেজে পড়তে পড়তেই তিনি সুযোগ পান সিনেমাতে অভিনয় করার। দেশপ্রিয় পার্কে আজাদ হিন্দ বাহিনীর সেনাদের সংবর্ধনা দেওয়ার অনুষ্ঠানে ভলেন্টিয়ার কোর বাহিনীর নেতৃত্বে ছিলেন তিনি। বাহিনীতে মঞ্জু দের নেতৃত্ব দেওয়া দেখে বিখ্যাত পরিচালক সুশীল মজুমদার তাঁকে দেশাত্মবোধক সিনেমাতে অভিনয়ের প্রস্তাব দেন।[৪] অবশ্য প্রথম সিনেমাতে অভিনয় করার সুযোগ ঘটে হিন্দি ছবি 'সিপাহী কি সাপনা'তে। এর পরে ১৯৫১ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত হেমেন গুপ্ত পরিচালিত '৪২' সিনেমাতে তাঁর অসামান্য অভিনয়, তাঁকে খাতির শীর্ষে নিয়ে যায়।[৫] ১৯৫৫ সালে যে আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব অনুষ্ঠিত হয়, তাতে ভারতের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করেন মঞ্জু দে। ১৯৫৮ সালে সিনেমায় ফটোগ্রাফি শিখতে লন্ডনে যান এবং ফিরে এসে সিনেমাতে অভিনয়ের পাশাপাশি পরিচালনা ও প্রযোজনা শুরু করেন। প্রযোজক হিসেবে তাঁকে প্রথম দেখা যায় 'অঙ্কুশ' (১৯৫২) ছবিতে। তাঁর পরিচালিত প্রথম সিনেমা 'স্বর্গ হতে বিদায়' মুক্তি পায় ১৯৬৪ সালে।[৬]

নাট্য জগত থেকে উঠে এসে নিজেকে একজন সফল অভিনেতা রূপে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, এমন একজন ব্যক্তিত্ব হলেন অভি ভট্টাচার্য। কলেজে পাঠরত অবস্থাতে রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করে তিনি খ্যাতি লাভ করেছিলেন। রঙ্গমঞ্চে তাঁর অভিনয়ের নৈপুণ্য সুযোগ করে দেয় চলচ্চিত্রে অভিনয় করার। তাঁর অভিনীত প্রথম ছবি হল 'নৌকাডুবি'। পরবর্তী সময়ে তিনি- দেবদূত, মায়ের ডাক ইত্যাদি সিনেমাতে অভিনয় করেন। তবে ঋত্বিক ঘটকের ছবি 'সুবর্ণ রেখা' তে তাঁর অভিনয় চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।[৭]

অভিনয়ের মতো শিল্প প্রতিভা সুপ্তভাবে থাকলেও, সঠিক সময় এলে তা ঠিক বিকশিত হবে। নাট্য নয়, চিত্রকলার মতো জগত থেকে উঠে আসতে পারে অভিনেতা-অভিনেত্রীগণ। চিত্রকলা জগতের এক বিখ্যাত নাম হল চারুচন্দ্র রায়। তিনি ১৮৯০ সালে বহরমপুরে জন্ম গ্রহণ করেন। ১৯২২ থেকে ১৯২৭ সাল পর্যন্ত 'সি.আর' নামে ব্যাঙ্গ চিত্র একে তিনি বিখ্যাত হয়ে যান। ইতিমধ্যে তিনি যুক্ত হয়ে পড়েন রঙ্গমঞ্চের শিল্প নির্দেশনার কাজে। শিশির কুমার ভাদুরির 'সীতা'

নাটকে শিল্প নির্দেশনার কাজ করে দেশেবিদেশে সমাদৃতও হন। ১৯২৫ সালে হিমাংশু রায়ের আহ্বানে সাড়া দিয়ে 'লাইট অফ এশিয়া' তে শিল্প নির্দেশনা অংশ গ্রহণের মধ্যে দিয়ে চারুচন্দ্র রায় চলচ্চিত্র জগতে নিজের আত্মপ্রকাশ ঘটান। শিল্প নির্দেশনার পাশাপাশি অভিনয়ে ক্ষেত্রেও তিনি প্রতিভার স্বাক্ষর রাখেন। তাঁর অভিনীত একটি সিনেমা হল 'সিরাজ'। চারুচন্দ্র রায়কে বেশ কিছু ছবি পরিচালকের ভূমিকাতেও দেখা যায়, যেমন- বিগ্রহ, চরকাটা, স্বামী, পথিক প্রভৃতি। বাংলা চলচ্চিত্র বিষয়ক প্রথম পত্রিকা 'বায়স্কোপ' এর সম্পাদনার কৃতিত্ব চারুচন্দ্র রায়ের।[৮] অর্থাৎ তিনি ছিলেন একজন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী।

মুর্শিদাবাদ জেলার দুই বিশিষ্ট চলচ্চিত্র পরিচালক হলেন তপন সিংহ ও বাসু ভট্টাচার্য। তপন সিংহের জন্ম জঙ্গিপুরের হিলোড়াতে।[৯] তিনি চলচ্চিত্রকে বাণিজ্যিক সফলতার পরিবর্তে শিল্পের আঙ্গিকে দেখতেন। তাঁর তৈরি সিনেমা কোন বাঁধাধরা গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকেনি। সিনেমার বিষয়ের মধ্যে বৈচিত্র্যও লক্ষণীয় ছিল। চলচ্চিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে তিনি প্রাধান্য দিয়েছিলেন সাহিত্যকে। বিংশতকের পঞ্চাশের দশকে ফিল্মের কাজ শেখার জন্য লন্ডনে যান। সেখান থেকে ফিরে এসে তিনি চলচ্চিত্র পরিচালকের ভূমিকাতে পদার্পণ করেন। তপন সিং পরিচালিত প্রথম ছবি হল অঙ্কুশ (১৯৫৪)।[১০] তাঁর বিখ্যাত ছবিগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল উপহার (১৯৫৫), টনসিল(১৯৫৬), যজ্ঞ কপাট(১৯৫৮), ক্ষুধিত পাষাণ (১৯৬০) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। জেলার আরেকজন পরিচালক বাসু ভট্টাচার্যের জন্ম সৈদাবাদের বাঙ্গালপাড়ায়।[১১] তাঁর পিতার নাম লক্ষ্মীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য ও মাতা নাম সুষমা ভট্টাচার্য। বাসু ভট্টাচার্য পড়াশোনার পাঠ সম্পূর্ণ করে মননিবেশ করেছিলেন সাহিত্যচর্চায়। কিন্তু তিনি সাহিত্যচর্চা ছেড়ে যোগ দিলেন সিনেমা পরিচালনায়। প্রথমে তিনি বিমল রায়ের সহকারী হিসেবে চলচ্চিত্র পরিচালনার কাজে হাত দেন। অবশ্য প্রথম দিকের সিনেমা পরখ, মধুমতী, সুজাতা ইত্যাদি ছবিগুলি পরিচালনা করেছিলেন বিমল রায়ের সহকারী রূপে। তাঁর পরিচালিত প্রথম ছবি 'তিসরি কসম' সেরা ছবি হিসেবে ১৯৬৭ সালে রাষ্টপতি পুরষ্কার লাভ করে। বাসু ভট্টাচার্য বিখ্যাত কালজয়ী সিনেমা তৈরি করেছেন। তবে সেগুলি আলোচ্য প্রবন্ধের সময়সীমা বহির্ভূত হওয়ায় অনালোচিত রইল।

সাহিত্যে ও সিনেমার মধ্যে গভীর সম্পর্ক রয়েছে। সাহিত্যের মাধ্যমে মানুষ

যেমন রসাস্বাদন করে। সেই সাহিত্যের কাহিনী, চরিত্র উঠে আসে চলচ্চিত্রে। সেই কাজটিকে আর সুচারু রূপে করেন পরিচালকগণ। বিংশ শতকে মুর্শিদাবাদ জেলায় আর্বিভাব ঘটেছিল একের পর এক সাহিত্যিকের। তাঁদের সাহিত্য কর্ম সমৃদ্ধ করেছিল জেলার সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলকে। ফলত এই জেলার সাহিত্য স্থান পেয়েছে বাংলা চলচ্চিত্রে। বহরমপুরের বিশিষ্ট সাহিত্যিক ছিলেন নিরুপমা দেবী। তাঁর সাহিত্যের মধ্যে দিয়ে সংসারের সুখদুঃখ, আনন্দবেদনা, কুসংস্কার পরিচয় যেমন পাওয়া যায়, তেমনি বহু বিবাহ, বাল্য বিবাহ, জাতিভেদ, বিধবা বিবাহের মত হাজারো সমস্যার কথা তুলে ধরেছেন তাঁর সাহিত্যে। পরিচালক তিনকড়ি চক্রবর্তী নিরুপমা দেবীর সাহিত্য অবলম্বনে তৈরি করেন 'অন্নপূর্ণার মন্দির' (১৯৩৬) সিনেমা।[১২] নিরুপমা দেবীর 'শ্যামলী' উপন্যাসটি নিয়ে তৈরি করা হয় 'শ্যামলী' নাটক। এই নাটকটির ব্যাপক জনপ্রিয়তার জন্য পরিচালক অজয় কর ১৯৫৬ সালে নাটকটিকে পর্দায় নিয়ে আসেন। এছাড়াও নিরুপমা দেবীর উপন্যাসের উপর 'দেবত্র', 'বিধিলিপি' প্রভৃতি চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছিল।[১৩]

সাহিত্য চলচ্চিত্রের রূপ পেয়েছে। আবার চলচ্চিত্রের মধ্যে ভেসে উঠেছে বাস্তবতা ও সমসাময়িক সমাজ, সংস্কৃতি ও ধর্মীয় ভাবাবেগ। মুর্শিদাবাদ জেলার একজন প্রথিতযশা নাট্যকার হলেন বিধায়ক ভট্টাচার্য। ১৯০৭ সালে জিয়াগঞ্জের ভট্টপাড়ায় তাঁর জন্ম। গল্প, কবিতা, উপন্যাস লেখাতে তিনি সিদ্ধহস্ত হলেও, তাঁর খ্যাতি ছিল একজন নাট্যকার হিসেবেই। তাঁর বিখ্যাত নাটক গুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল মাটির ঘর, রক্তের দাগ, রাজপথ, ক্ষুধা, ঢুলী প্রভৃতি। বিখ্যাত নাট্যসাহিত্য সৃষ্টির কৃতিত্ব যার, সেই বিধায়ক ভট্টাচার্যের মধ্যে দেখা যায় অভিনেতার রূপ। সুযোগ আসে চলচ্চিত্রে অভিনেতা হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার। সেই সুযোগকে তিনি সুচারু রূপে ব্যবহার করে পা রাখেন চলচ্চিত্র জগতে। তাঁর অভিনীত বিখ্যাত সিনেমা হল- 'উত্তর মেঘ'।[১৪]

সাহিত্য যে চলচ্চিত্রের উপজীব্য বিষয় তার এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ হল ১৯৫৪ সালে মুক্তি প্রাপ্ত 'ঢুলি' সিনেমাটি। অবশ্য মুর্শিদাবাদের প্রেক্ষিতে সিনেমাটি অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। কারণ সিনেমাটির কাহিনী নেওয়া হয়েছিল প্রখ্যাত নাট্যকার বিধায়ক ভট্টাচার্যের রচনা 'ঢুলি' থেকে। বিধায়ক ভট্টাচার্য জিয়াগঞ্জের সন্তান হওয়ায়, স্বাভাবিক ভাবে উঠে এসেছে জিয়াগঞ্জের কথা। যদিও সিনেমাটির মূল

কেন্দ্রবিন্দু জিয়াগঞ্জ। এই শহরে যে আদি দুর্গা পুজো অর্থাৎ লালগোলার মহারাজাদের দ্বারা যে মন্দির ও পুজো পরিচালিত হতো। সেই মন্দিরের ঢুলি ছিলেন পরাশর দাসের পিতা। 'ঢুলী' শব্দের অর্থ ঢোলবাদক বা বাঙালি ঢোলবাদক সম্প্রদায়। এই ঢুলি সম্প্রদায়ের সন্তান পরাশরের জীবন ও কাহিনীকে কেন্দ্র করে নির্মিত হয়েছে আলোচ্য সিনেমাটি। ১৯৫৪ সালে পিনাকী মুখার্জি পরিচালিত 'ঢুলি' সিনেমাটি কলকাতার রাধা, প্রাচী, পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পায়। এই ছবিতে মুখ্য ভূমিকায় অভিনয় করেন পাহাড়ী সান্যাল, সুচিত্রা সেন, প্রশান্ত কুমার, মালা সিংহ, ছবি বিশ্বাস প্রমুখ। 'ঢুলি' ছবিতে পরাশরের পূর্বপুরুষগণ ঢাক বাজাতেন । তবে পরাশরের পছন্দ ছিল আরেকটু সম্মানের পেশা। ফলত তিনি পাড়ি দিলেন কলকাতাই সঙ্গীত শিখতে। অতঃপর সেখানে দুই নারীর প্রেমে পড়েন। এই প্রেম কে কেন্দ্র করে এক নাটকীয় সংঘাত তৈরি হয়েছে। দুই নারীর টানাপড়েনে বিধ্বস্ত পরাশর নিজের গ্রামে ফিরে আসেন এবং উপলব্ধি করেন যে ঢাক বাজানোর পেশা অনেক সম্মানের। এই সিনেমা জিয়াগঞ্জের দুর্গাপুজোর আবহকে ধরে রেখেছে। কাহিনীর প্রয়োজনে ব্যবহিত হয়েছে বাংলা মন্দির, গঙ্গা নদীর তির, রানি ভবানী মন্দির প্রভৃতি স্থান। জিয়াগঞ্জ শ্মশানের শীতল ডোমকে এই সিনেমাতে ছোট একটা ভূমিকায় অভিনয় করতেও দেখা যায়।[১৫]

সিনেমাতে মুর্শিদাবাদকে বিভিন্ন ভাবে তুলে ধরা হয়েছে। কোনও অঞ্চলের কাহিনীর প্রেক্ষাপট হতে পারে মুর্শিদাবাদ। সেক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠে কাহিনীর দাবি, পরিচালকের পছন্দ এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধা। আবার কাহিনী বা চরিত্রের দাবীদার হিসাবে প্রাধান্য পেয়েছে লোকেশন। মুর্শিদাবাদ জেলার ঐতিহাসিক চরিত্র ও ঘটনাকে কেন্দ্র করে কয়েকটি সিনেমা নির্মিত হয়েছে। যেমন- অমর দত্ত পরিচালিত 'সিরাজউদদৌলা' (১৯৫২) এবং রতন চ্যাটার্জী পরিচালিত 'রানি ভবানী'(১৯৫২)। 'সিরাজ উদ দৌলা' ছবিতে কাহিনীর প্রয়োজনে পরিবেশিত হয়েছে হাজারদুয়ারি, ইমামবাড়া, মতিঝিল, খোসবাগ, ভাগীরথী নদীতীর, ভগবানগোলার বিভিন্ন স্থান। আর 'রানি ভবানী' সিনেমাতে চিত্রায়িত হয়েছে আজিমগঞ্জে রানি ভবানীর বাড়ি, শিব মন্দির, টেরাকোটার বিভিন্ন স্থাপত্য ও ভাগীরথীর অববাহিকা। কাহিনী ও স্থান যেভাবে চিত্রায়িত হয়েছে চলচ্চিত্রে, মনে হতে পারে এ যেন ঐতিহাসিক ঘটনারই প্রত্যাবর্তন।[১৬]

বিশ্ববরণ্য ও আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পূর্ণ দুজন চলচ্চিত্রকার হলেন সত্যজিৎ রায় ও ঋত্বিক কুমার ঘটক। মূলত এই দুই পরিচালকের সিনেমাতে মুর্শিদাবাদ তাঁর পারিপার্শ্বিকতা নিয়ে ফুটে উঠেছে। চলচ্চিত্রে মুর্শিদাবাদকে নানা ভাবে ব্যবহার করা হয়েছে তাঁদের সিনেমাতে। কখনও কাহিনীকে তাঁর ঐতিহাসিক রূপ দিতে বা চারিত্রের প্রয়োজনে ব্যবহার করা হয়েছে বিভিন্ন জায়গা। আবার কাহিনীর লোকেশন হিসেবে উঠে এসেছে মুর্শিদাবাদের কথা। সত্যজিৎ রায়ের তিনটি সিনেমাতে এই জেলার কথা উঠে এসেছে। সিনেমা তিনটি হল 'জলসাঘর' (১৯৫৮), 'দেবী' (১৯৬০) এবং 'তিনকন্যার' অন্তর্গত 'সমাপ্তি' (১৯৬১)। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোট গল্প 'জলসাঘর' অবলম্বনে সত্যজিৎ রায় তাঁর 'জলসাঘর' সিনেমাটি তৈরি করেন।[১৭] অভিনয় করেছেন ছবি বিশ্বাস, পদ্মা দেবী, পিনাকী সেনগুপ্ত, কাশী সরকার প্রমুখ অভিনেতা অভিনেত্রী। 'জলসাঘর সিনেমাতে দেখানো হয়েছে জমিদার বিশ্বম্ভর বাবুর পতন। আসলে তিনি সমাজের ক্ষয়িষ্ণু জমিদার তন্ত্রের পতনকে দেখাতে চেয়েছেন। উঠে এসেছে জমিদারদের সঙ্গীত প্রিয়তার কথাও। সত্যজিৎ রায়ের 'জলসাঘর' সিনেমার শুটিং হয়েছে মুর্শিদাবাদের নিমতিতা রাজবাড়িতে।[১৮] স্বাভাবিক ভাবেই এখানে একটা প্রশ্ন দেখা দিতে পারে, জলসাঘরের শুটিং এর জন্য নিমতিতা রাজবাড়িকেই কেন বেঁছে নিলেন?

জমিদার গৌরসুন্দর চৌধুরী এবং তাঁর খুঁড়তুতো ভাই দ্বারকানাথ চৌধুরীর ইচ্ছা ও পরিকল্পনা অনুসারে নিমতিতা রাজপ্রাসাদটি নির্মিত হয়। এক সময় লোকারণ্য ও সুসজ্জিত প্রাসাদটি বর্তমানে ধ্বংস প্রায় অবস্থা। দ্বারকানাথের মৃত্যুর পর তাঁর দুই পুত্র মহেন্দ্রনারায়ণ ও জ্ঞানেন্দ্র নারায়ণ এই এস্টেটের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন এবং তাঁদের সময় নিমতিতা রাজবাড়ি শিল্প ও সংস্কৃতির জগতে খ্যাতি অর্জন করে। জমিদার মহেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর নাটকের প্রতি বিশেষ আকর্ষণ ছিল। তিনিই ত্রিতল উচ্চতাবিশিষ্ট ও বিজলিবাতি সমৃদ্ধ নিমতিতা 'হিন্দু থিয়েটারের' রঙ্গমঞ্চটি তৈরি করেন। বিখ্যাত কয়েকটি নাটক অভিনীত হয়েছিল এই রঙ্গমঞ্চে। যাইহোক, সত্যজিৎ রায় 'জলসাঘর' সিনেমাটি তৈরির জন্য চিত্রগ্রহণের জায়গার সন্ধানে প্রথমে লালগোলা রাজবাড়ি পরিদর্শন করেন। কিন্তু সেটা তাঁর পছন্দ না হওয়ায় কাঞ্চনতলার জমিদার বাড়িটি দেখতে যান। কিন্তু সেটাও তাঁর মনপূত হয়নি। অবশেষে তিনি নিমতিতা রাজবাড়ি ভ্রমণ করেন এবং জায়গাটা তার পছন্দ হয়ে

যায়। পছন্দ হওয়ার অন্যতম একটি কারণ হল গঙ্গার নিকটবর্তী অবস্থান। পরে তিনি কলকাতা ফিরে গিয়ে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং এই নিমতিতা রাজবাড়ির কথা বলেন। তখন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় বিস্মিত হয়ে বলেন যে 'নিমতিতা জমিদার বাড়ি নিয়েই তাঁর রায়বাড়ি ও জলসাঘর গল্প দুটি লেখা। অর্থাৎ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'জলসাঘর' হল এই নিমতিতা রাজবাড়ির 'জলসাঘর'। ফলত কাহিনী, ইতিহাস ও স্থান এক জায়গাই মিলিত হয়ে, চলচ্চিত্র রূপে প্রকাশ পেয়েছিল 'জলসাঘর'। সত্যজিৎ রায় ১৯৫৭ সালে নিমতিতা বাড়িতে 'জলসাঘর' সিনেমার চিত্রগ্রহণ সম্পূর্ণ করেন।[১৯] জলসাঘরের সফলতাই মুগ্ধ হয়ে সত্যজিৎ রায় তাঁর পরবর্তী সিনেমা 'দেবী'র (১৯৬০) শুটিং করেন এই নিমতিতা রাজবাড়িতে। ১৯৫৯ সালে 'দেবী' সিনেমার চিত্রগ্রহণ শুরু হয়। শুটিং চলাকালীন অভিনেতা-অভিনেত্রী থেকে শিল্পের সহায়ক কলাকুশুলি, আলোকসজ্জা, রথ, নদীতর, মাটির দেবী প্রতিমা, শুটিং দেখতে আশা দর্শকবৃন্দ সব মিলিয়ে বাড়িটিতে এক বিরাট আলোড়ন ও হৈ হৈ ব্যাপার মনে হয়। দ্বারকানাথ চৌধুরীর নাতবৌ ৮২ বছরের বৃদ্ধা বিধবা সবিতা চৌধুরীর স্মৃতিচারণা থেকে জানা যায় যে, 'শুটিং চলার পর্বে ছবি বিশ্বাসের 'ঘোড়াকে আদর করার দৃশ্যটি তিনবার নেওয়ার পর 'ওকে' হয়। এই সময় ছবি বিশ্বাস কপালের ঘাম মুছছেন দেখে দলেরই একজন জিজ্ঞেস করেন- কষ্ট হচ্ছে কিনা? ছবি বিশ্বাস রসিকতা করে উত্তর দিলেন মাথা কপালের ঘাম ফেলেই তো আমাদের রোজকার।[২০]

এই সিনেমাটির আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল 'দেবী' ছবিটির তৈরি করতে যে মন্দিরের সেট নির্মাণ করা হয়েছিল। তা এই বাড়ির মন্দিরের আদলেই তৈরি। ইতিহাসের সাথেও চলচ্চিত্রটি জড়িয়ে গিয়েছিল। অভিনয়ের জন্য শর্মিলা ঠাকুরের ইমিটেশন গহনাপত্র কলকাতা থেকে আনানো হয়েছিল। কিন্তু কানে পরার জন্য 'কানপাশ' (সোনার একপ্রকার গহনা) আনতে ভুল হওয়ায়, ওই বাড়ির সিন্দুক থেকে প্রাচীনকালেরে কানপাশ শর্মিলাকে ব্যবহার করতে দেওয়া হয়েছিল। কে জানত জনপ্রিয় এই ছবিতে নায়িকার কানে ব্যবহিত কানপাশটি ঐতিহাসিক ছিল।[২১] ছবিটিতে একটি জমিদার পরিবারকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে। একদিকে ধর্মান্ধতা ও কুসংস্কার কে দেখানো হয়েছে। সেখানে জমিদার কালিকিঙ্করের অন্ধবিশ্বাসে তাঁর পুত্র বধূ দয়াময়ী একটি দেবীতে পরিণত হয়েছে এবং উমাপ্রসাদের আলোকিত

চিন্তাধারাকে তুলে ধরা হয়েছে। সিনেমাটি রাষ্ট্রপতি রৌপ্য পদক পায় ১৯৬০ সালে। তার তিনকন্যার অন্তর্গত সমাপ্তি সিনেমার শুটিং হয়েছে ওই নিমতিতা রাজবাড়িতেই।

ঋত্বিক কুমার ঘটকের সিনেমাতে মুর্শিদাবাদের কোথা উঠে এসেছে। তাঁর 'কোমল গান্ধার' (১৯৬১) ছবিতে ব্যবহার করা হয়েছে ভগবানগোলা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল।[২২] 'কমল গান্ধার' ছবিটি ১৯৬১ সালের ৩১ মার্চ রাধা, পূর্ণ, লোটাস, পূরবী প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি লাভ করে। অভিনয়ে ছিলেন অনিল চট্টোপাধ্যায়, সুপ্রিয়া চৌধুরী, শেখর চট্টোপাধ্যায়, চিত্রা মণ্ডল, গীতা দে প্রমুখ। এই সিনেমার কাহিনীর কেন্দ্র ভূমিতে রয়েছে প্রেম। আবার ছবির পটভূমিতে রয়েছে দেশ ভাগের জ্বালা যন্ত্রণা। 'কোমল গান্ধার' ছবিতে তিনটি সম্পর্কের টানাপড়েনের স্তর লক্ষ্য করা যাই-ব্যক্তি সম্পর্কে, গোষ্ঠী সম্পর্কে, দুই ভূখণ্ডের সম্পর্ক। নায়ক, নাট্য পরিচালক সবসময় বয়ে বেরায় দেশভাগের স্মৃতি। অর্থাৎ ছবিটিতে আত্মচরিতের উপস্থিতির মধ্য দিয়ে সমাজের এক অংশের বাস্তবতাকেই তুলে ধরা হয়েছে।

সুতরাং বাংলা চলচ্চিত্র জগতে মুর্শিদাবাদের অংশগ্রহণ বেশ সমাদৃত হয়েছিল। তবে জেলার ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক গুরুত্বের তুলনায় মুর্শিদাবাদকে নিয়ে খুব কম ছবিই চিত্রায়িত হয়েছে। হয়ত সিনেমা তৈরির পরিকাঠামোর অভাব এর একটি কারণ। ব্যতিক্রম শুধু সত্যজিৎ রায়ের তিনটি ও ঋত্বিক ঘটকের একটি সিনেমা। এই সিনেমা গুলিতে জেলার দুটি অঞ্চলের কথা উঠে আসে- নিমতিতা রাজবাড়ি ও ভগবানগোলা। মুর্শিদাবাদ জেলাতে যে সমস্ত প্রখ্যাত সাহিত্যিকগণের আবির্ভাব ঘটেছিল, তাঁদের মধ্যে হাতে গোনা কয়েকজনের সাহিত্যই স্থান পেয়েছে সিনেমাতে। এমনকি মুর্শিদাবাদের প্রেক্ষাপটে সৈয়দ মুস্তফা সিরাজ, আবুল বাশার, অতিন বন্দ্যোপাধ্যায় যে ছোটগল্প বা উপন্যাস রচনা করেছেন তা চলচ্চিত্রে রূপায়িত হয়নি। তা সত্ত্বেও বলা যায় যে, আলোচ্য সময় কালে মুর্শিদাবাদ থেকে যে সব অভিনেতা-অভিনেত্রী ও পরিচালকগণ বাংলা চলচ্চিত্রের ইতিহাসে স্থায়ী অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। যা ভবিষ্যতে এই জেলাকে সিনেমার পাদপ্রদীপে তুলে নিয়ে আসবে, তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

তথ্যসূত্র

১. কল্যাণ কুমার দাস(সম্পা.), শতবর্ষে রাধারানী দেবী, শিল্পনগরী প্রকাশনী, বহরমপুর, ২০১৫, পৃ. ৫৬।

২. প্রকাশ দাস বিশ্বাস, মুর্শিদাবাদ চরিতাভিধান, প্রকাশক- অভিজিৎ রায়, ২০১৪, বহরমপুর, পৃ. ১৬৫।
৩. তদেব।
৪. গৌরাঙ্গ প্রসাদ ঘোষ, সোনার দাগ, যোগমায়া প্রকাশনী, ২০১০, পৃ. ৩৫২।
৫. তদেব।
৬. তদেব।
৭. গৌরাঙ্গ প্রসাদ ঘোষ, তদেব, পৃ. ১৫৩।
৮. প্রকাশ দাস বিশ্বাস, তদেব, পৃ. ৭৪।
৯. তদেব, পৃ. ৮৬।
১০. তপন সিংহ, চলচ্চিত্রে আজীবন, দে'জ প্রকাশনী, কলকাতা, ২০০৯, পৃ. ৮।
১১. প্রকাশ দাস বিশ্বাস, তদেব, পৃ.১২৮।
১২. নির্মাল্য আচার্য ও দিব্যেন্দু পালিত, শতবর্ষে চলচ্চিত্র(দ্বিতীয় খণ্ড), আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০১৬, পৃ. ৫৬৭।
১৩. https://www.anandabazar.com/supplementary/patrika/article-on-fiction-writer-nirupama-devi-1.956501, 02/01/2021.
১৪. প্রকাশ দাস বিশ্বাস, তদেব, পৃ. ১৩১।
১৫. মানবেন্দ্রনাথ সাহা, 'মুর্শিদাবাদে চলচ্চিত্র: চলচ্চিত্রে মুর্শিদাবাদ', মুর্শিদাবাদ অনুসন্ধান, অরিন্দম রায় (সম্পা.), ২০১২, পৃ. ২৭৬।
১৬. তদেব, পৃ.২৭৫৭৬।
১৭. মানবেন্দ্রনাথ সাহা, সাহিত্য ও চলচ্চিত্রঃ সত্যজিৎ রায়ের চলচ্চিত্র, প্রভা প্রকাশনী, কলকাতা, ২০০২, পৃ. ৪৬।
১৮. ঝড়, বিষয়: মুর্শিদাবাদ, সেপ্টেম্বর, ২০০৪, পৃ. ৪৫৭।
১৯. তদেব, পৃ. ৪৫৭-৫৮।
২০. তদেব, পৃ. ৪৬০।
২১. তদেব।
২২. মানবেন্দ্রনাথ সাহা, 'মুর্শিদাবাদে চলচ্চিত্রঃ চলচ্চিত্রে মুর্শিদাবা', তদেব, পৃ.২৭৫-৭৬।